



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 153 – 162

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বিশ শতকের তিনটি বাংলা ছোটগল্পে দারিদ্র্য, দাম্পত্য ও প্রেম :
মঙ্গলকাব্যের শিব-পার্বতী উপাখ্যানের বিনির্মিত বয়ান

পৃথা দে

Email ID : dey.pritha1311@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024

Selection Date 20. 07. 2024

Keyword

Deconstruction,
Poverty,
Relationship,
Chastity, twentieth
century, gender
politics,
mangalkavya,
society.

Abstract

This essay is about the application of the deconstruction theory on the Bengali short stories of twentieth century. This writing focuses on two angles, one of them is the short stories of a particular century and the other one is the tale of Shiv-Parvati in the Mangalkavyas; which belongs to the era of medieval in Bengal. Now, this essay has tried to connect the literature based texts from two different centuries by the help of deconstruction theory. The texts have been explained in a way where these can be connected and disconnected at the same time through a comparative discussion. The correlation has set on the basis of poverty, relation between spouses, the definition of love, the interpretation of chastity of women, gender politics in a household.

The deconstruction theory is a medium through which it will be established that how the gender role, the financial power game, bonding between partners has been evolved in an opposite direction from the era, where we were told the tale of Shiv-Parvati. Along with this, I will be discussing on some more insights about some uniqueness of the Shiv-Parvati tale in Mangalkavyas. This writing has revolved around the protagonist characters of the selected short stories and Shiv-Parvati from Mangalkavyas. Through the Contrast and Conflict of characters and situations from different timeline, I have tried to show the real picture of society, the truth of economy, anarchy of times. In twentieth century's Bengal, everything was falling apart, yet there was hope, there was partnership, there was love. Women were growing as an earning member of their household. It was new for them, so, their legs were shaking because they sometimes chose the path that they did not willing to walk on but for the sake of family they had to walk on those unwanted lanes. Women had to learn the survival skills. Were they different from Parvati? Did Parvati has any similarity with these women? Here the contrast begins!



Discussion

শিব পার্বতীর উপাখ্যান কোন দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে নেই? খুঁজলে সর্বত্র রয়েছে। এই খোঁজ করার জন্য প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টির। নির্মাণের উপরের খোলসকে টেনে খুলে ফেলতে পারলেই তার মধ্যে বিধৃত হবে এক অন্য নির্মাণ। সেই অন্য নির্মাণকে কখনো আসল নির্মাণের পাশাপাশি রাখা চলে নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে; আবার কখনো, তাকে রাখতে হয় নির্মাণের বিপরীতে, একেবারে মুখোমুখি। তখন তাকে আমরা বলতে পারি বিনির্মাণ। ইতিমধ্যেই গঠিত হয়ে যাওয়া ছকের উপর নতুন করে আঁকিবুকি করা নয় বরং পুরনো ছককে ভেঙে দিয়ে এই বিনির্মাণের পথ চলা শুরু হয়। কোন টেক্সটের মাইক্রো লেভেলে সুগু থাকে বিনির্মাণের অসংখ্য সম্ভাবনা, যা মুক্ত করে দিলে তৈরি হয় বহুস্বর -

“এক মেরু অন্য মেরুর স্থান নেওয়াতে এবং নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প প্রকট হওয়াতে যথাপ্রাপ্ত পরিসর পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে।”^১

বহুস্বর কখনো কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তা সময়ের উল্টো চাকায় বসে চলে যেতে পারে বিশ শতক থেকে সেই মধ্যযুগে। মধ্যযুগ থেকে তুলে আনতে পারে কোন এক মঙ্গলকাব্য, কোন এক শিব-পার্বতীর দাম্পত্যলীলা। বিনির্মাণ আসলে সময়ের পরোয়ানাকে অবজ্ঞা করে। সর্বোপরি নর-নারীর সম্পর্কের অনুপাত আবিষ্কার করে ফেলা যায় কখনো সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘স্বয়ম্বর’ ও ‘কানাকড়ি’ গল্পে; কখনো আবার জ্যোতিরীন্দ্র নন্দীর ‘বন্ধুপত্নী’ গল্পের মধ্যে। মধ্যযুগের দাম্পত্য প্রেম এবং বিশ শতকের সম্পর্ক - সন্ধির তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গে সাদৃশ্যের দিক থেকে নয়; বরং বৈসাদৃশ্যের দিকেই অধিক প্রবণতা। বিনির্মাণের উৎপত্তি বৈপরীত্যের পক্ষ নেওয়ার জন্যই। বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধ ভাব, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত, বিরুদ্ধ পরিণতি - এসবই বিনির্মাণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই, পূর্বে উল্লিখিত গল্পত্রয়কে রাখা যায় শিব-পার্বতী উপাখ্যানের বিরুদ্ধ চিত্র হিসেবে।

শিব পার্বতীর উপাখ্যানের মধ্যে কোন ঐশ্বরিক মাধুর্য নেই; বরং, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিব পার্বতীর সংসার সেই মধ্যযুগেরই পরিচয় বহন করে-

“মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর ভাবনাতে ছোঁয়া লেগেছে তৎকালীন ইতিহাসের, তাদের স্বভাব- চরিত্র নির্মিত হয়ে উঠেছে বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে।”^২

এই মধ্যযুগীয় দাম্পত্যের সংসারে স্বর্গীয় অলৌকিকতা প্রায় নেই বললেই চলে। যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে, তা কেবলমাত্র লৌকিকতা। সাধারণ বাঙালি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কোন তফাৎ নেই দেব-দেবীর। তাদের স্বভাব, চরিত্র, চিন্তা, ভাবনা, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া সমস্তটাই প্রখর মানবিক আবেদনের সাহচর্যে নির্মিত হয়েছে। এই মানবীয় নির্মাণের মধ্যে এত অজস্র খুঁত রয়ে গেছে; যে, সহজাতভাবেই দেবদেবীর সংসারকে মানবের মর্ত্য বলে মনে হয়। স্বর্গের ছবি যখন মানুষ রচনা করতে বসেছে, তখন তা স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্তের ভিড়ে এসে যে পৌঁছবে, তা অনুমান করাই যায়।

“বৈদিক সভ্যতার যুগে আর্যরা যে করুণাময় ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের কল্পনা করেছিল, তার সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালির দেব-পরিকল্পনার কোনো সাদৃশ্য নেই।”^৩

মধ্যযুগের দাম্পত্য ও বিশ শতকের দাম্পত্যের মধ্যে ফারাক করা কঠিন। মঙ্গলকাব্যের শিবের সংসারে নিত্য অভাব। সেই অভাবের তাড়নায় জেরবার হতে থাকে হর-গৌরীর যাপন। মঙ্গলকাব্যের শিব এক বেকার বৃদ্ধ। এই বেকার ও বৃদ্ধ শিব মস্ত পৃথিবীর সারকথাটুকু বিবাহের পূর্বেই বলে দেয় পার্বতীকে-

“শুনো গো গুণময়ী

তোমারে হিত কহি

দরিদ্রে কেহ না আদরে

দরিদ্র প্রতি জার

বিফল জন্ম তার

দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে।”^৪



এই সাবধান বানী শুনে প্রবল ইচ্ছা করছে সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘স্বয়ম্বর’ গল্পটির কথা বলতে। এই সাবধান বাণীকে কেন্দ্র করেই বিনির্মিত হয়েছে গল্পটি। মধ্যযুগের এই সতর্কবাণী বিশ শতকেও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল। দরিদ্র মানুষ প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে চিরকাল, ঠিক যেমন করে প্রেম কখনো অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না!

এই গল্পের লীলা একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আটজন মানুষের সংসার সে একাই টানে। অনুপম তাকে ভালোবাসে, প্রেমপত্র দেয় ভাঙ্গির দিদিমণিকে। অনুপম তখন বেকার যুবক। বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলা লীলা রুঢ় স্বরে অনুপমকে বলে -

“গরিবের মেয়ে কোনরকমে পাস করেছে, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপরেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়।”^৫

প্রেমের অনুভূতিকে নস্যাৎ করে জীবনের চূড়ান্ত সত্যকে সে প্রাধান্য দিয়ে বলেছে -

“সংসারে উপরি কাটা টাকা আনতে”^৬

শুধু তাই নয়, সে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর থেকেও একই রকমের আশা রাখে -

“মা, বাবা, ছোট তিন বোন, নাবালক দুই ভাই, আমাকে ভালোবাসেন বলছেন; পারবেন এদের ভার নিতে?”^৭

লীলা জানে জীবনের প্রাথমিক শর্ত কোনটি! অর্থ। তাই সে কোন বেকার যুবককে জীবনসঙ্গী করতে সম্মত নয়। প্রেমকে সে চাকরি দিয়ে মেপেছে। কিন্তু পার্বতী তপস্যা করে যে শিবকে পেল, সে বেকার এক বৃদ্ধ; তা জানা সত্ত্বেও দ্বিধামুক্ত থেকেছে পার্বতী -

“আমার কপালে হর লিখিয়াছে বিধি
তাহার সেবিত পদ জনম অবধি”^৮

কিন্তু সেই পার্বতীও ঠিক দু'লাইন পরেই বলেছে-

“ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করেন অঞ্জলি
ইন্দ্র জার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।”^৯

অর্থাৎ পার্বতী তার হবু স্বামীর অর্থের থেকে বেশি মর্যাদা আছে কিনা, তার দিকে খেয়াল রেখেছে। কিন্তু বিশ শতকে অর্থ কৌলিন্যই সব। যার অর্থ নেই, তার মর্যাদাও নেই!

এই গল্পের লীলা অনুপমের প্রেম প্রত্যাখ্যান করল ঠিকই, কিন্তু, তখন তো সদ্য গল্প শুরু হয়েছে! এরপরই তার জীবনে হঠাৎ করে আসে স্মরজিৎ। সে বেকার নয়। সে মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেন্ট করে। নিব, কলম, পেন্সিল, চক, ব্লটিং কাগজ এসবের ক্ষুদ্র ব্যবসা তার। স্মরজিৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত। লীলারই মতো তার আর্থিক অবস্থা, বা হয়তো আরও একটু মন্দের দিকেই। উপরন্তু, বাম হাত তার কাটা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লীলা ও স্মরজিৎ ঘনিষ্ঠ হয়। তখনও লীলা জানেনা স্মরজিৎের আর্থিক অবস্থা, তার ঘরের দশা-

“কিন্তু, কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ...মাটির দেয়াল, স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস-মুরগি-পায়রার যদৃচ্ছ বিচরণ দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার হওয়া চলে না।”^{১০}

সব মানুষের মতো লীলাও জীবনে একটা উত্তরণ চেয়েছে। নারী হয়ে পুরুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে উত্তরণের যে বাসনা, তা নতুন নয়। মর্যাদাহীন হতে পারে, তবে, অস্বাভাবিক নয়। নারীর এই স্বভাব ছিন্ন করে, সেখান থেকে বেরিয়ে



এসে, লীলা স্মরজিতের প্রেমে পড়ে। শুধু প্রেম নয়; তার সঙ্গে ঘর বাঁধার, দাম্পত্যে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যেই অনুপম আবার ফিরে আসে প্রভূত অর্থ উপার্জন করার পর এবং বিয়ে করতে চায় লীলাকে। সে কোথাও না কোথাও লীলার কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিল কিন্তু, লীলা ততদিনে স্মরজিৎ ও তার বিকলাঙ্গ জীবনকে ভালোবেসে ফেলেছে। পার্বতী ও লীলার মধ্যে আশাতীত ফারাক রয়েছেই গেল শেষ পর্যন্ত -

“দারুন কর্মের দোষে হইলাও দুঃখিনী
ভিক্ষার ভাতে দারুন বিধি করিল গৃহিণী।”^{১১}

পার্বতী ভিক্ষুক স্বামীর গৃহিণী হয়েছে বলে আফসোস করে। কিন্তু লীলা বিশ শতকীয় কন্যা। মধ্যযুগ ও বিশ শতকের দীর্ঘকালের ব্যবধানের বার্তা লীলা নিজের মধ্যে ধারণ করে রয়েছে। তাই, পার্বতী মধ্যযুগ থেকে উঠে এসেছে বলে যা করতে পারেনি, তাই-ই করে দেখায় লীলা -

“যখনই অবসর পেয়েছে, মিত্র কোম্পানির মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত।”^{১২}

গল্পের সূচনায় লীলা নিজের মধ্যকার মধ্যযুগীয় পরনির্ভরতা ঘুচিয়ে গল্পের শেষে সে হয়ে ওঠে বিশ শতকের নারী। উনিশ শতকে নারী স্বাধীনতার যে বীজ রোপিত হয় নগর কলকাতায় সেই বীজ থেকে সোনার ফসল হয়ে উদ্ভূত হয় স্বয়ম্বরা গল্পের লীলা। সে জানে দুই নারী পুরুষের সংসার চলে পার্টনারশিপের মধ্য দিয়ে। তাই সেও তার মনের মানুষের কাজে সাহায্য করে। সে বুঝেছে জীবনে উন্নতি প্রয়োজন, তবে একাকী নয়। বিশ শতক সময় পর্বটা আর্থিক দিক থেকেও মানুষকে নিঙড়ে নিয়েছিল; তবুও প্রেম, সে তো নিত্য!

প্রেম-পরিণয়, পরিবর্তন, উপার্জন নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় গল্প সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কানাকড়ি’। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সাবিত্রী ও মন্মথ। মন্মথ চাকুরিজীবী। কিন্তু তার নিজের কোন বাসা ছিল না বিয়ের পরেও। তাই, বিয়ের পর বাপের বাড়িতেই থাকতে হত সাবিত্রীকে। মন্মথ প্রতি শনিবার গিয়ে থাকতো সেখানে। ঘরজামাই থাকার রীতি বাংলাদেশে বরাবরই নিন্দার। সেই যুগ থেকে সামাজিক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়নি।

মঙ্গল কাব্যে গনেশ ও কার্তিকের জন্মের পর শিব, পার্বতীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকেছে বহুদিন। এই নিয়ে মেনকার গঞ্জনাও শুনতে হয়েছে তাকে-

“তোমায় ঝি হইতে মোর মজিল গার্যাল
ঘরে জাঙাঞ রাখিআ পুষিব কতকাল।
মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাই চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বারো মাস।”^{১৩}

অপমানিত হয়ে পার্বতী স্বামী সন্তান নিয়ে কৈলাসে ফেরে। সাবিত্রীও বাপের বাড়িতে স্বামীকে চিলেকোঠায় শুতে দেওয়ার অপমান সহ্য করতে না পেরে মন্মথকে বলে বাসা ভাড়া নিতে। সেই ভাড়া বাড়ির পরিবেশ সাবিত্রির পছন্দ না হওয়ায় মন্মথ তাকে কর্কশ ভাষায় বলে -

“তুমি তখন কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে না হয় গাছ তলাতে থাকব, সেও সুখ।”^{১৪}

হাজার অভাবের মধ্যেও মন্মথের ভেতর একটা গুমোর ছিল -

“আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি।”^{১৫}



শিব পার্বতীর সঙ্গে মন্থন - সাবিত্রীর কালের মিল না থাকলেও, দাম্পত্য সম্পর্কের মিল অবশ্যই রয়েছে। আবারও একটি ঘটনায় এই সাদৃশ্য আরও একটু প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সাবিত্রী তার প্রতিবেশী মল্লিকাদির কাছে অভাব অনটনের লজ্জা লুকিয়ে তাকে মিথ্যা কথা বলে যে, সে রাতে মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি রাঁধবে। তারপর মল্লিকাদি রাতের খাবারে তার জন্য একটু বাঁধাকপি তুলে রাখতে বলায় বিপদে পড়ে সাবিত্রী। স্বামীর কাছে তার মিনতি -

“আমার মান বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। ...হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিয়ে এসো।”^{১৬}

ঠিক এই রকম মানহানির ভয় শিব-জায়া পার্বতীরও ছিল। শিবের কাছে দু’গাছি শাখা চেয়েছিল সে; কারণ লোকসমাজে তার দারিদ্র্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে, এই নিরাপত্তাহীনতা পার্বতীর মধ্যে ছিল। ‘প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : প্রথম খন্ড’ এই বইটিতে শিবায়ন থেকে এই উক্তি গৃহীত হয়েছে -

“লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই
 হাতে নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই”^{১৭}

মধ্যযুগে মানুষের মর্যাদা বিচার হত তার আর্থিক স্বচ্ছলতার মানদণ্ডে, বিশ শতকেও তার তেমন কোন হেরফের হতে আমরা দেখি না। সাবিত্রীর আবদারে বিরক্ত হয় মন্থন, সে বলে -

“মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই। শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি, তার ওপর এসব কি পাগলামি?”^{১৮}

প্রায় একই অভিযোগ পার্বতীর। যদিও শিবের বালখিল্যতার প্রতি পার্বতীর অভিযোগ-রাগিনীতে রয়েছে বক্রতা -

“আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল
 তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তন্মূল।”^{১৯}

কর্তা গিন্নির কথোপকথন যেন চির পুরাতন। তার স্বর-সুর সবই পুরনো। একে অপরের কথায় যে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাও যেন একই রকম -

“একটা বালিশ নিয়ে মন্থন বাইরের রকে শুতে গেল।”^{২০}

হর-গৌরীর বিবাদের পর শিব ঘর ছাড়তে উদ্যোগী হয় -

“আমি ছাড়িবো ঘর
 জাইবো দেশান্তর
 কি মোর ঘরকরণে।”^{২১}

‘কানাকড়ি’ গল্পের কাহিনী এরপর যদিকে মোর নেয়, সেদিকটা মধ্যযুগের হর-গৌরীর সম্পর্কের অনুপাতের থেকে ভিন্ন তথা বিপরীত। এই গল্পের পরবর্তীতে মন্থনের চাকরি চলে যায়। সে তখন বেকারত্বের চাপে প্রত্যহ পিষছে নিজে। সাবিত্রী তখন তার বিয়ের আংটি স্বামীর কাছে দিয়ে তাকে নতুন জুতো কিনতে বলে। চাকরির জায়গায় কথা বলতে গেলে, জুতো যে মানুষের শ্রেণি নির্ণয় করে, তা সে জানে। এই ভাবেই সাবিত্রী দাম্পত্যে যুগলবন্দীর পাঠ শেখায় আমাদের। শিব ভিক্ষুক। হর-গৌরীর সংসারে সন্তান আসার পর অধিকাংশ সময়ে আধপেটা থাকতে হচ্ছে তাদের। দারিদ্র্যের কোন শ্রেণী হয় না। মানব শ্রেণী হোক বা দেবতা শ্রেণী; খাদ্যাভাব দেবতাকেও করে তুলতে পারে হিংস্র-

“অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিবের দৈব মহিমার কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলেও সামগ্রিক বিচারে দেখা গেছে দৈব মহিমা থেকে বড় হয়ে উঠেছে তার মানবীয় রূপ। কাহিনী যত অগ্রসর হয়েছে ততই তার শিবত্ব



লোপ পেয়েছে, আর তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের পরিচিত মানুষ, দোষে গুণে পরিপূর্ণ অতি সাধারণ মানুষ।”^{২২}

‘কানাকড়ি’ গল্পে মন্থ যখন চাকরি পাওয়ার আশা ছেড়ে দেয়, তখন তার অভ্যন্তরীণ অহংকারও মূর্ছিত হয়ে পড়ে। সাবিত্রী, শশাঙ্ক নামক এক সিনেমা পরিচালকের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। তার থেকে সিনেমার ছোট কোন চরিত্রে কাজ আদায় করতে চায়। কোনরকমে যদি সংসারকে বাঁচানো যায়, তার ছোট্ট খুকির জন্য একটু যদি খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে; সেই চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার ভেতরের সংস্কার তার জীবিকা অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ‘সতীত্ব’ সম্পর্কে তার বন্ধমূল ধারণা তাকে পিছুটানের মধ্য দিয়ে আবদ্ধ করে ফেলে। তার অনমনীয় মনোভাব মন্থের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সে বলে -

“তীব্র স্বরে মন্থ বলল কি ক্ষতি হতো তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিত?... ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়; খুশি হলে উপকারও করে। সুচি বায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে?”^{২৩}

এই কথা শুনে সাবিত্রী স্তম্ভিত। মন্থ যে নিজেও কতটা ভাগনের পথ দিয়ে হেঁটে এসে কথা বলে, তার হিসাব কেউ চায়নি; না সাবিত্রী, না কথক। এইখানেই বিনির্মিত হল হর-গৌরীর চিরাচরিত দাম্পত্য আখ্যান।

বিশ শতকের পুরুষ তার নারীকে অন্য পুরুষের কাছে না যেতে পারার অক্ষমতাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। মন্থ নুইয়ে পড়ে কালের সম্মুখে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মন্থের চারিত্রিক বিবর্তন আসলে বিশ শতকীয় আর্থিক অরাজকতার জীবাশ্ম।

‘সতীত্ব’ - এই শব্দকে কেন্দ্র করে সাবিত্রির ধারণা নমনীয় ছিল না। মন্থ কি তবে সতীত্ব নামক কুসংস্কারকে মান্যতা দেয়নি কখনো? যদি নাই দিত, তবে, মল্লিকার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রসঙ্গে সে এই উক্তি করত না-

“কী কেলেঙ্কারি! এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল! ছি, ছি পেটে খাবার জন্য কত ছোট কাজই না করে মানুষ।”^{২৪}

‘সতী’ কাকে বলব? এই প্রশ্ন থেকেই পরের গল্পে পাড়ি দেওয়া যায় - জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী রচিত ‘বন্ধুপত্নী’। এই গল্পের চরিত্র সুবিনয়, তার স্ত্রী অরুনা এবং কথক সুধাংশু। গল্পে সুবিনয় ও সুধাংশু চরিত্র দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সুধাংশু তার স্ত্রীকে স্বতন্ত্র মানুষের মর্যাদা দিয়েছে, সেখানে তার বন্ধু সুবিনয় নিজের অধিকার জাহির করেছে অরুনার ওপর, তার ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর -

“স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয়। আমি স্ত্রী শাসনের পক্ষপাতী।”^{২৫}

আমরা যদি আবার একটু মঙ্গলকাব্যের হরগৌরী পালায় ফিরে যাই, তাহলে সেখানে কিন্তু হর এবং পার্বতী উভয় উভয়কে শাসন করছে। পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি এখানে যেন একটু নড়ে যায়। কারণ, মঙ্গলকাব্যের গৌরী মুখ বুজে সব সহ্য করে না। সে ধৈর্যশীল নয়, সে অসহায় নয়। সংসারের ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত গৌরীকেই নিতে দেখা যায় সেখানে। অকর্মণ্য শিবের প্রতি সে বিতর্কিত হয়ে পড়ে -

“কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষনা ঘর
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।”^{২৬}

অরুনা স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে না। সে মঙ্গলকাব্যের পার্বতী চরিত্রের এক বিরুদ্ধচিত্র অঙ্কনে ব্রতী হয়েছে এই গল্পের সূচনা পর্বে। কথক অরুনা সম্পর্কে গল্পের শুরুর দিকে বলে-

“বৌদি মাথা ঠান্ডা রেখে সব ধীরে সুস্থে করছে বলেই দিনকে দিন এমন ফুল বাগানের মত সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার।”^{২৭}



অরুনার স্বামী সুধাংশুর সামনেই তাকে অপমান করে। লজ্জাবোধ করে সুধাংশু। অরুনা তবুও চুপ। সুধাংশু ক্রমশ আকর্ষিত হয় অরুনার স্থিতধীর প্রতি, তারপর তার সৌন্দর্যের প্রতি। অরুনা স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে সংসার করতে গিয়ে বাড়ির কাজে নিমজ্জিত থাকে সে।

অপরদিকে, পার্বতী সর্বক্ষণ শিবকে অভিযোগ জানায়। ভিক্ষুক জেনেও পার্বতী বিয়ে করে ঠিকই কিন্তু সংসারের অভাব, অনটন তাকে তিক্ত, রুচ ও কর্কশ করে তোলে। কিন্তু শিব অলস। তার স্বল্প আয়ে সে খুশি। এমন কোন চাহিদা নেই, যা সে মেটাতে চায়। অন্যদিকে পার্বতীর শখ আছে, সুখের চিন্তা আছে। তার সাধনালব্ধ স্বামী, তার সাধ পূরণে অপারগ।

অরুণার শখ আছে; কিন্তু শখের থেকে তার প্রয়োজনটাই বেশি। তবে তা স্বামীর জন্য। তাই সে রাতের অন্ধকারে সুধাংশুকে তার স্বামী সম্পর্কে বলেছে -

“এই শীতে ক’টা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে, আগামী বর্ষায় নির্ধাত অসুখে পড়বে। কিন্তু, টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।”^{২৮}

অরুনা তার স্বামীর মঙ্গল চায়, তাকে ভালোবাসে। এই মঙ্গল কামনা চরিতার্থ করার স্বার্থে সে সতীত্বের ধারণাটির আধুনিকীকরণ করে নিয়েছে মনে মনে। সতীত্বের অমূলক সংস্কার তার মধ্যে নেই। গল্পের শেষে অরুনা তার দ্বিচারিতাকে প্রকাশ্যে আনে। সুধাংশুর সঙ্গে রাতে একাকী কথা বলার সময়, সুধাংশু যখন তার হাত চেপে ধরে, তখন অরুনা বুঝতে পারে যে এটাই মোক্ষম সময়। অরুণার প্রতিক্রিয়া দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় সুধাংশু -

“আশ্চর্য! অতিরিক্ত সময় অরুনা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে, সরিয়ে নেবার নূনতম চেষ্টা না করে, ধীর ঠান্ডা গলায় বলল- এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে। ছি, ছি কী ছিড়ি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো অফিস কাছারি করছে!”^{২৯}

অরুনা, সাবিত্রী নয়। সে জানে টিকে থাকার লড়াই করতে।

“ভ্রান্ত মানুষটি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মত অরুনার অনাবৃত সাদা হাত চেপে ধরে, কিন্তু গল্পের চাবুক হল অরুনার সংলাপ।”^{৩০}

কথক ‘আশ্চর্য’ কথাটি ব্যবহার করেছেন, কারণ অরুণার যে স্নিগ্ধ রূপ তিনি দেখেছেন, তা দেখে অরুনার প্রত্যাখ্যানই বোধ হয় তিনি আশা করেছিলেন। অরুণার এই পদক্ষেপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় সোহিনীকে। রবীন্দ্রনাথের ‘ল্যাবরেটরী’ গল্পের সোহিনীকে। ল্যাবরেটরীর প্রতি তার যে কমিটমেন্ট, সেটাই তার কাছে সতীত্বের একমাত্র সংজ্ঞা। নারী দেহতে সেই সংজ্ঞাকে সে ধারণ করেনি। একই ভাবে অরুনার কমিটমেন্ট তার স্বামী ও সংসারের মঙ্গলময়তার প্রতি, তাদের প্রয়োজনবোধের প্রতি। সেখানে সে শরীরকে তুচ্ছ মনে করেছে। বিশ শতকে দাঁড়িয়ে সোহিনীর মতোই সে জানে যে আদর্শ দিয়ে, আইডিয়া দিয়ে সংসার চলে না।

“সোহিনী নিছক আইডিয়ার মধ্যে বেঁধে রাখেনি এই সতীত্বকে।”^{৩১}

গল্পের মধ্যে জানা যায় যে, বাড়িতে পেইনগেস্ট রেখে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের উপায় অরুনাই বলেছে সুবিনয়কে। সেই অতিরিক্ত অর্থে নিজের কোন শখ সে পূরণ করতে চায় না তার আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র তার স্বামীর সুস্থ, মর্যাদাপূর্ণ জীবন।

এই গল্পে আমরা শিব পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের এক অন্যরকম বিনির্মাণ লক্ষ্য করি। এই বিনির্মাণ ঘটেছে সূক্ষ্ম স্তরে, নিঃশব্দে। অল্পদামঙ্গল কাব্যে পার্বতীকে অল্পপূর্ণা হয়ে শিবের ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়েছে। পার্বতী স্বমহিমায় গ্রহণ করেছে সেই গুরুদায়িত্ব। জয়ার উপদেশ পার্বতীর প্রতি -



২. নস্কর, সনৎ কুমার, 'মঙ্গলকাব্যের দেব দেবী চরিত্র : আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা:), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : প্রথম খন্ড, পৃ. ১৭১
৩. চক্রবর্তী, রেখা, 'আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমাজ চিত্র ও সমাজ চেতনা', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা:), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : প্রথম খন্ড, পৃ. ২৭৮
৪. সেন, সুকুমার, (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ১৯
৫. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'স্বয়ম্বর', বিষ্ণু বসু (সম্পা:), 'চিরন্তন নারী', পৃ. ২৬৪
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. সেন, সুকুমার, (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ১৯
৯. ঐ
১০. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'স্বয়ম্বর', বিষ্ণু বসু (সম্পা:), 'চিরন্তন নারী', পৃ. ২৭০
১১. সেন, সুকুমার (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ২৭
১২. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'স্বয়ম্বর', বিষ্ণু বসু (সম্পা:), 'চিরন্তন নারী', পৃ. ২৭৩
১৩. সেন, সুকুমার (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ২৫
১৪. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'কানাকড়ি', 'পারাবত', পৃ. ১৫৫
১৫. ঐ, পৃ. ১৫৭
১৬. ঐ, পৃ. ১৫৯
১৭. চক্রবর্তী, রেখা, 'আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমাজ চিত্র ও সমাজের চেতনা', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা:), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : প্রথম খন্ড, পৃ. ২৭৯
১৮. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'কানাকড়ি', 'পারাবত', পৃ. ১৫৯
১৯. সেন, সুকুমার, (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ২৬
২০. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'কানাকড়ি', 'পারাবত', পৃ. ১৫৫
২১. সেন, সুকুমার, (সম্পা:), চন্দ্রীমঙ্গল, পৃ. ২৭
২২. মুখোপাধ্যায়, নিশীথ, (সম্পা:), অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৬৬
২৩. ঘোষ, সন্তোষ কুমার, 'কানাকড়ি', 'পারাবত', পৃ. ১৮১
২৪. ঐ, পৃ. ১৬৩
২৫. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, 'বন্ধুপত্নী', নির্বাচিত গল্প, পৃ. ৯৪
২৬. মুখোপাধ্যায়, নিশীথ, (সম্পা:), অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৫২
২৭. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, 'বন্ধুপত্নী', নির্বাচিত গল্প, পৃ. ৯৮
২৮. ঐ, পৃ. ১০৫
২৯. ঐ, পৃ. ১০৭
৩০. পাল, রবিন, 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প'; বাংলা ছোট গল্প কৃতি ও রীতি, পৃ. ১৬৮
৩১. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, রবীন্দ্র গল্প বারে বারে ফিরে দেখা, পৃ. ৪৭১
৩২. মুখোপাধ্যায়, নিশীথ, (সম্পা:), অন্নদামঙ্গল, পৃ. ৫৫
৩৩. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, নির্বাচিত গল্প, পৃ. ১০৬
৩৪. পাল, রবিন, 'বাংলা ছোটগল্পের রূপরীতি'; বাংলা ছোট গল্প: কৃতি ও রীতি, পৃ. ২৪৮



Bibliography:

- অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক, এবং মুশায়েরা প্রকাশনী, ২০২২, কলকাতা
- জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নির্বাচিত গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০, কলকাতা
- তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩, কলকাতা
- তপোধীর ভট্টাচার্য, জাঁক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, কলকাতা
- তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গল্প বারে বারে ফিরে দেখা, গ্রন্থ বিকাশ প্রকাশনী, ২০১৬, কলকাতা
- নিশীথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা:), রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০২২, কলকাতা
- বিষ্ণু বসু (সম্পা:), চিরন্তন নারী, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩, কলকাতা
- ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; করুণা প্রকাশনী, ১৯৬১, কলকাতা
- মঞ্জুরিতা চক্রবর্তী, বিনির্মাণে বাংলা ছোটগল্প, এবং মুশায়েরা প্রকাশনী, ২০২২, কলকাতা
- রবিন পাল, বাংলা ছোট গল্প কৃতী ও রীতি, এবং মুশায়েরা প্রকাশনী, ২০২২, কলকাতা
- সুকুমার সেন (সম্পা:), কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চন্দীমঙ্গল, সাহিত্য একাডেমী, ২০১৩, কলকাতা
- সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পা:), প্রবন্ধ সংগ্ৰহ : প্রথম খন্ড; রত্নাবলী প্রকাশনী, ২০১৩, কলকাতা
- সন্তোষ কুমার ঘোষ, পারাবত, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৩, কলকাতা